খসড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

জেআরপি ২০২০ বিষয়ে মন্তব্য এবং রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় এডভোকেসিতে সিসিএনএফ/ স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের অবস্থান

রোহিঙ্গা মানবিক কার্যক্রমে জেআরপি ২০২০-কে হতে হবে সত্যিকার অর্থেই একটি 'যৌথ পরিকল্পনা'। স্বচ্ছতা ও স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক

দীর্ঘ প্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে একটা 'ব্যবস্থার' উদ্যোগ নিন: বর্তমান ব্যবস্থা সাময়িক ও অসংগঠিত মনে হয়

১. আমাদের অবস্থান: কার্যকর সমাধান? নাকি দীর্ঘমেয়াদী বিশৃংখলা?

আমরা, **এসইজি (স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ)-এ স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ** রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুতকৃত **জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) ২০২০-এর খসড়ার** বিষয়ে আমাদের অবস্থান জানাতে এই অবস্থানপত্রটি উপস্থাপন করছি। জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থাসমূহ রোহিঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে আইএসসিজি (ইন্টার সেক্টোরাল কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ)-কে নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য এই এসইজি গঠন করেছে। আমরা কক্সবাজারে মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট স্থানীয় নাগরিক সমাজ সংগঠনের নেটওয়ার্ক সিসিএনএফ (কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম www.cxb-cso-ngo.org)-এরও অংশ, এবং আমরা রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় 'স্বল্পমেয়াদী এবং প্রত্যাবাসন'-এর পরিবর্তে 'দীর্ঘমেয়াদী এবং প্রত্যাবাসন'-এর জোরালো সমর্থক। প্রত্যাবাসসেন কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু তা হতে হবে টেকসই, অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের যাতে বার বার এদেশে না আসতে হয়। বিলম্বিত হলেও, আইসিজে ও আইসিসি'র কারণে এবার কিছু উৎসাহব্যাঞ্জক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিস্থিতি খুবই গতিশীল, প্রতিদিন পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং এ ধরনের দলিলের ক্ষেত্রে সকল ধরনের অংশীজনের (স্টেকহোল্ডার) মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এই অবস্থানপত্রের খসড়াটি তৈরি করার সময় আমরা বেশ কিছু বিষয়-ধারণা বিবেচনায় এনেছি। প্রথমত, **আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবতার স্বার্থে এবং নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দিয়েছিলেন**, তাঁর সেই উদার মানবিক চেতনার জন্য আমরা গর্বিত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে এবং আমরা এই প্রশংসনীয় অবস্থান ধরে রাখতে চাই। আমরা Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF), জাতিসংঘে বাংলাদেশ কর্তৃক সেপ্টেম্বর ২০১৬-তে প্রস্তাবিত Global Compact on Migration and Global Compact on Refugees -এর মূল চেতনাগুলোর প্রতি আমাদের সমর্থন পুনর্ব্যাক্ত করতে চাই। আমরা সামগ্রিক সমাজ পদ্ধতি বা Whole of Society Approach (WoSA) এবং New Way of Working (NWoW) পদ্ধতিকে আমাদের কাজের অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে হিসেবে বিবেচনা করি। জাতিসংঘের প্রায় সকল সংস্থা এবং দাতাদের স্বাক্ষরিত গ্র্যান্ড বার্গেইন (২০১৬) প্রতিশ্রুতি এবং শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক এনজিওগুলি (বেসরকারী সংস্থা) স্বাক্ষরিত চার্টার ফর চেঞ্জ (২০১৫) হলো অর্থ সহায়তা স্থানীয়করণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আমরা মনে করি, জাতিসংঘের যেসব অঙ্গসংস্থাএবং যেসব আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ প্রতিশ্রুতির উল্লেখিত দলিলগুলোতে স্বাক্ষর করেছে, তাদের সেই প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করা উচিৎ। এই ঐতিহাসিক দলিলগুলোকে শুধুমাত্র কাগুজে প্রতিশ্রুতি হিসেবে পরিণত করা সমীচীন হবে না।

এমতাবস্থায়, আমরা শিবিরগুলিতে রোহিঙ্গা পরিবারগুলোর এক ধরনের স্বনির্ভরতা, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মায়ানমার পাঠ্যসূচির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (আমরা গর্বিত যে সরকার ইতিমধ্যে তা অনুমোদন করেছে), আবাসন সমস্যা নিরসনে সহজে স্থানান্তরযোগ্য বাসস্থানের সুপারিশ করি। পাশাপাশি স্থানীয় টেকসই সংস্থা, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় এনজিওগুলির মাধ্যমে ত্রাণ কর্মসূচি পরিচালনা, তথা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্থানীয়করণ নিশ্চিত করারও সুপারিশ করি। স্থানীয়করণের মূল কথা হলো- ত্রাণ কর্মসূচির সবক্ষেত্রে যথা সম্ভব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সর্বোপরি, আমরা সামগ্রিক কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের একটি একক কর্তৃত্বের প্রস্তাব করি, যেখানে জাতিসংঘের সংস্থাগুলির যুক্তিসঙ্গত-ভারসাম্যপূর্ণ সম্পৃক্ততা-অংশগ্রহণ থাকবে। ক্রমহ্রাসমান আর্থিক সহায়তার বিষয়টি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে স্থানীয়দের কাছে শুধু দক্ষতা হস্তান্তরই নয়, ভবিষ্যতে সুরক্ষা এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার সম্ভাব্য বিষয়গুলো বিবেচনা করেই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট বিশ্বের অন্যান্য এলাকার শরণার্থী পরিস্থিতির চেয়ে আলাদা, কারণ এখানে কোনও সশস্ত্র সংঘাত নেই। প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় সম্প্রদায়ই নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে সবার আগে দাঁড়িয়েছিলো। সুতরাং এই ইতিবাচক উপাদানগুলি স্থানীয়করণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. সংকট মোকাবেলা প্রক্রিয়াকে সু-সংহত করতে এবং সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের জন্য একটি 'একক কর্তৃত্বে'র প্রয়োজন

জেআরপি ২০২০ অসম্পূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ, এটা কতটুকু যৌথ একটি পরিকল্পনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসহ বেশ কয়েকটি সংস্থা রয়েছে যারা জেআরপি প্রক্রিয়ায় তাদের তথ্য প্রেরণ করে না। এমনকি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের করা ব্যয়ের তথ্য জেআরপিতে উল্লেখ নেই। আইএসসিজি পরিচালিত হয় প্রধানত জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং দুটি আন্তর্জাতিক এনজিওর বিদেশী কয়েকজন কর্মীদের দ্বারা। স্থানীয় এনজিও বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের এখানে খুব কমই অংশগ্রহণ রয়েছে, অথচ ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আগমনের পর থেকেই সিসিএনএফ সংকট মোকাবেলার সকল পর্যায়ে স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণের দাবি করে আসছে। **আইএসসিজি একটি 'অপ্রতুল অংশগ্রহণমূলক' সংস্থায় পরিণত হয়েছে, কারণ খুব কম সংস্থার উপরই এর কর্তৃত্ব রয়েছে,** এবং স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে সংস্থাটি কখনই চেষ্টা করেনি। স্থানীয় পর্যায়ে কী পরিমাণ কেনাকাটা হয়েছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে, এবং স্থানীয়দের জন্য কী পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পরিসংখ্যান দিতে আইএসসিজি কেন পারে না, সে বিষয় সংস্থাটিকে ভেবে দেখতে হবে।

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সংস্থা শরণার্থী পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি)। এই সংস্থাটির সঙ্গে আইএসজি'র কার্যক্রমগত (Functional) কিছু সম্পর্ক রয়েছে। আরআরআরসি কার্যালয় প্রকৃতপক্ষে বেশ কয়েকজন ক্যাম্প ইন চার্জ (সিইসি)-এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা শিবিরগুলিকে মূল নিয়ন্ত্রণটি করে থাকে। অন্যদিকে কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) জেলার উন্নয়নের বিষয়গুলিতে নেতৃত্ব দেন। আইএসসিজি ডিসি অফিসের সাথে প্রায় একই ধরণের সম্পর্ক বজায় রাখে। উল্লেখিত সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে কারো উপর কারো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে না।

জেআরপি ২০২০-এর বিষয়গুলো কেবল নামমাত্র কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু জেআরপি ২০২০ একটি পরিকল্পনা এবং এটি কোনও কর্তৃপক্ষ নয়, এর সুনির্দিষ্ট কোনও কর্তৃত্বও নেই, আর এ কারণেই পরিকল্পনাগুলোতে বাহুল্য বা অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি থাকাও স্বাভাবিক। এখন যেহেতু আর্থিক সহায়তা কমে যাওয়ার প্রবণতা এবং সুরক্ষা ও সংঘাতের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের স্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে, সেখানে এ জাতীয় সমান্তরাল সংস্থা বা সমান্তরাল পরিকল্পনা থাকা উচিত নয়। আইএসসিজে'র পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, আর্থিক অবস্থার মনিটরিং শক্তিশালী করা, চাহিদা নিরূপণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, সংস্থাটিকে আরআরআরসি অফিসের সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থাগুলোর চিন্তা করা উচিৎ। শেষ পর্যন্ত রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলার পুরো প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারকেই নেওয়া উচিৎ। **প্রাথমিক পর্যায়ে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সরকারি সংস্থাগুলোর সক্ষমতা জোরদার করার উদ্যোগ নিতে পারে, এক্ষেত্রে একটি 'সমান্তরাল পদ্ধতি'র (parallel approach) চেয়ে 'সহযোগী সংস্থা' দৃষ্টিভঙ্গি' (counterpart approach) অধিকতর কার্যকর, কারণ এটি কম ব্যয়বহুল এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরকে সহজতর করে।**

স্থানীয় এনজিওরা হলো রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনার জটিল প্রক্রিয়াটির সবচাইতে 'বিপন্ন' বা একিলিস হিল (Achilles heel), আর একারণেই তারা এই ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনায় নিরুৎসাহিত হচ্ছে। কক্সবাজারের বাস্তবতায় স্থানীয় এনজিও বলতে আমরা এমন এনজিওকে বুঝি যা কক্সবাজারে উদ্ভূত এবং / অথবা এর নেতৃত্ব এই জেলায় জন্ম নিয়েছেন। স্থানীয় সংস্থাগুলি তাদের বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নানা ধরনের জটিলতায় ভুগছে। কোনও প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চাইলে সেটা অনুমোদনের জন্য তাদেরকে অনেকগুলো প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। যদি তারা কোনও উপকরণ বিতরণ করতে চায় তবে তাদেরকে প্রায় ১২টি বিভিন্ন দফতরের অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। নিয়মানুযায়ী তাদের জেলা প্রশাসক কার্যালয়, আরআরআরসি অফিস, ক্যাম্প ইনচার্জ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কেউই তাদের এই সংকটের বিষয়টি নিয়ে কখনো কথা বলেননি, সমাধানের জন্যও এগিয়ে আসেননি। অন্যদিকে, জাতিসংঘের সংস্থাগুলি এবং তাদের অংশীদারী আন্তর্জাতিক এনজিওদের খুব কমই এধরনের এতগুলো প্রক্রিয়া বা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। বলাবাহুল্য যে, স্থানীয়করণের জন্য স্থানীয় এনজিওগুলির অংশগ্রহণ এবং সার্বিক প্রক্রিয়ায় তাদের সহজ প্রবেশাধিকার আবশ্যক।

এমন কাঙ্ক্ষিত অবস্থা কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো রাখতে চাই:

i. **আইএসসিজি'র বিভিন্ন সেক্টরের নেতৃত্বে স্থানীয় এনজিওর অন্তর্ভুক্তি,**

ii. Head of Sub Office Group (HoSoG) **এবং কক্সবাজারের আইএসসিজি'র নিয়মিত সভাগুলোতে নেতৃত্বে স্থানীয় এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে আসতে হবে,**

iii. **কক্সবাজারে আগত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে স্থানীয় এনজিও/সিসিএনএফ নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতের সুযোগ করে দিতে হবে,**

iv. **কক্সবাজারে মানবিক কর্মসূচি পরিচালনায় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলার প্রচলন করতে হবে,**

v. **জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং আইএসসিজি-র সকল বিদেশী কর্মীকে বাংলা ভাষা এবং স্থানীয় সাংস্কৃতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত, এবং**

vi. **বিদেশী সকল কর্মীকে Principles of Partnership (2007), Grand Bargain Commitment (2016), New Way of Working (NWoW, 2016) Charter for Change (2016) and Global Compact on Refugee / Comprehensive Refugee Response Framework-এর উপর বিশেষ ধারণা দিতে হবে। সকল বিদেশী কর্মীর এসব চুক্তির/দলিলগুলোর পটভূমি এবং মূল চেতনা সম্বন্ধে ধারণা থাকা উচিৎ।**

৩. জেআরপি ২০২০ কাঠামোর উপর পর্যবেক্ষণ: এটি কি ফলাফল ভিত্তিক এবং স্থানীয়ভাবে লাগসই?

জেআরপি ২০২০ প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমাদের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ রয়েছে:

(ক) সাধারণত বিদ্যমান সমস্যা বা প্রয়োজনই কোন পরিকল্পনার যৌক্তিকতা তুলে ধরে, এবং তারপরে নির্ধারণ করা হয় পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য- উদ্দেশ্য এবং এর সম্ভাব্য ফলাফল। **সম্ভাব্য ফলাফলগুলি যাচাই করার সুবিধার্থে সাধারণত তৃতীয় কোন পক্ষ দ্বারা এই জাতীয় পরিকল্পনা পর্যালোচনাও করে দেখা প্রয়োজন।** জেআরপি-তে এ ধরনের কোন কিছু খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

(খ) **জেআরপি'র মধ্যবর্তী পর্যালোচনা এবং চাহিদা নিরুপণ মূলত করা হচ্ছে জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো দ্বারা, স্থানীয় এনজিওগুলোর এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নেই।** এর ফলে স্বল্পব্যয়ী কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল অর্জনে সক্ষম স্থানীয় কৌশলগুলোকে এই পরিকল্পনায় কাজে লাগানো যায়নি।

(গ) পরিবেশ বা প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং সবুজায়ন করার ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহার না করার নির্দেশনা থাকতে পারতো। **স্থানীয় এবং পরিবেশসম্মত নানা স্থানীয় উপকরণ-পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারতো।** আর **একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- শিবিরের অভ্যন্তরে পরিবার ভিত্তিক যতটুকু সম্ভব স্বনির্ভরতা তৈরি করা। সকল ক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্থানীয়ভাবে, স্থানীয় উৎস থেকে করার একটি বাধ্যবাধকতা থাকতে পারতো। আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি করার সুযোগ রয়েছে।**

জেআরপিতে এসব ঘাটতি রয়েছে, কারণ এটি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় স্থানীয়দের অংশগ্রহণ ছিলো না।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বিবেচনা করা হলে জেআরপি ২০২০ বা আইএসসিজি হতে পারতো শক্তিশালী। অথচ এনজিও প্ল্যাটফর্ম (এনজিওপি) এনজিও সমন্বয়ের জন্য কাজ করছে, যা কিনা আবার পরিচালিত হয় ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল নামের বিদেশী একটি এনজিও দ্বারা। এটিকে সরকারী সকল বিধি মেনে চলতে হবে এবং এটি বিদেশী অর্থায়নের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জেআরপি ২০২০ পরামর্শ নিতে পারতো সিসিএনএফ থেকে, যা স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের একটি নেটওয়ার্ক এবং এনজিওপি গঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এটি কাজ করে আসছে। সিসিএনএফ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয়করণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সপক্ষে প্রচারণা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। সিসিএনএফ বিদেশী তহবিলের উপর নির্ভরশীল নয়, তবুও তারা প্রায় ১৩টি অনুষ্ঠান এবং তৃণমূল পর্যায়ে ১০টি সামাজিক আন্দোলনের আয়োজন করেছে। উল্লেখ্য যে, **গ্র্যান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতিমালা নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির পরিবর্তে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান এবং সক্ষমতাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেয়।**

আমরা আইএসসিজিকে আরও তিনটি নতুন খাত বা সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি, সেগুলো হলো:

I. **শান্তি প্রতিষ্ঠা**, বিশেষ করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য। এই খাতটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে সামাজিক সম্প্রীতি, শিক্ষা এবং উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণার মতো কার্যক্রম

II. **পরিবেশ পুনরুদ্ধার**, আমরা বিশ্বাস করি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশের পুনরুজ্জীবন এবং পুনরুদ্ধারের জন্য এখনো অনেক সৃজনশীল উপায় আছে

III. **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিনিয়োগ**, কোন রকম বৈষম্য না রেখেই জেআরপি'র ২৫% স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করা বাঞ্চনীয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যাপারে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন রয়েছে, আর তাই এই বিষয়টি শুধুমাত্র কক্সবাজারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ করে রাখা উচিত নয়

IV. **আমরা মনে করি, সাইট ও ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরত্ব দিতে হবে,** এবং

V. পরিবার পরিকল্পনাটি স্বাস্থ্য খাত বা সেক্টরের অগ্রাধিকারের বিষয় হওয়া উচিৎ।

৪. রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে স্থানীয়করণের সম্ভাবনা: স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ

আগস্ট ২০১৭ এর শুরু থেকেই সিসিএনএফ মানবিক কর্মসূচিতে গ্র্যান্ড বার্গেইন (জিবি) প্রতিশ্রুতি, চার্টার ফর চেঞ্জএবং জাতিসংঘের এনডাব্লুওডাব্লু (NWoW) বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে আসছে। **রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে সিসিএনএফ স্থানীয়করণের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিল কারণ এক্ষেত্রে কোনও সশস্ত্র সংঘাত নেই এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ই আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে সবার আগে এগিয়ে আসে, সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও নির্যাতিতদের প্রতি সহানুভূতি ছিল।** ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে গ্র্যান্ড বার্গেইন ফিল্ড মিশন স্থানীয়করণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা দিয়েছে। **এসইজি ইতিমধ্যে একটি স্থানীয়করণ টাস্ক ফোর্স (এলটিএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে ইউএনডিপি এবং আইএফআরসি কো-চেয়ার হিসেবে রয়েছে এবং ইউএনডিপি ইতিমধ্যে ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই বিষয়ে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়নের জন্য একটি পরামর্শক দলকে অর্থায়ন করেছে।** সিসিএনএফ নিম্নোক্ত চারটি বিষয় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয়করণ বাস্তবায়নের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে:

(ক) **রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং মাঠকর্মীদের মধ্যে জিবি, সি৪সি এবং এনডাব্লুডাব্লু-এর বিষয়ে ভালো সচেতনতা থাকতে হবে।** সিসিএনএফ মনে করে যে, স্থানীয়করণের প্রস্তাবনা ও উদ্যোগুলো প্রথমে তাদের কাছ থেকেই আসা উচিত।

(খ) বাংলাদেশের এনজিও খাত একটি বিকাশমান খাত, তাই এখানে ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি (আই এএসসি)-এর সংজ্ঞা বিবেচনা করে **'জাতীয়' এবং 'স্থানীয়' এনজিওদের মধ্যকার পার্থক্যকে স্পষ্ট করতে হবে।** রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যেসব এনজিও-র উদ্ভব কক্সবাজারে বা এর নেতৃত্ব এসেছে কক্সবাজার থেকে। এর পরে জাতীয় এনজিগুলো প্রকল্প পেতে পারে। যেসব এনজিও'র সঙ্গে এদু'টি বৈশিষ্ট্য মিলে না, তারা অর্থ না পেলে ককক্সবাজারে কাজ নাও করতে পারে, এমনকি স্থানীয় সংস্কৃতি-ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে সম্পর্কে যে জ্ঞান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন, তাদের সেই সেই জ্ঞান নাও থাকতে পারে।

(গ) বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে ১৯৯২ এর পর থেকে কক্সবাজারে জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মাঠ পর্যায়ে সরাসরি উপস্থিতির কারণে কক্সবাজারে স্থানীয় এনজিও'র বিকাশ তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। কক্সবাজারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধিত এনজিও রয়েছে মাত্র ৭টি, অন্য জেলাতে এই সংখ্যা প্রায় ১০-এর বেশি। আর তাই, আমরা অনেক আগে থেকেই স্থানীয় সংস্থাগুলিকে রক্ষা করতে এবং তাদেরকে ভবিষ্যতে মানবাধিকার ও শরণার্থী অধিকার রক্ষায় সক্ষম করে তুলতে **কক্সবাজারের জন্য একটি 'মনজিও পুলড ফান্ড'র জন্য প্রস্তাব করে আসছি।**

(ঘ) আমরা স্থানীয়করণের ভুল ব্যাখ্যা করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করছি। কেউ কেউ আন্তর্জাতিক সংস্থায় স্থানীয় কর্মীদের নিয়োগকে স্থানীয়করণ বলে বিবেচনা করছেন, তবে কোনভাবেই এটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়করণ হলো স্থানীয় সংস্থা এবং স্থানীয় সরকারের মুখ্য ভূমিকা এবং নিয়ন্ত্রণ ।

জেআরপি ২০২০ তে যাওয়ার আগে:

i. এলটিএফের সুপারিশগুলো কী এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন হবে তার উল্লেখ থাকতে হবে। **স্থানীয়করণকে হতে হবে একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা, অর্থ কমে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে স্থানীয়করণকে বিবেচনা করা ঠিক হবে না**
ii. **অনতিবিলম্বে HoSoG এবং আইএসজি সভাগুলোতে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে**
iii. এসইজি এবং অন্যরা যখন অংশগ্রহণের কথা বলে, এক্ষেত্রে **স্থানীয় এনজিও'র উপরোল্লেখিত সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিৎ।**

৫. রোহিঙ্গাদের প্রয়োজন আশ্রয়ের জন্য সহজে স্থাপনযোগ্য ঘর, রোহিঙ্গা পরিবারের স্বনির্ভরতা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা

আমাদের সরকার রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছে, এটি দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গতিপথকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। **যদিও আমরা কক্সবাজারের লোকজন রোহিঙ্গা আগমনের ফলে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, কিন্তু এরপরেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার যে নিদর্শন দেখিয়েছেন সেটাকে অব্যহত রাখতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো।**

এমতাবস্থায়, আমরা শিবিরগুলিতে সহজে স্থাপনযোগ্য (Pre-fabricated) ঘর দেওয়ার আহ্বান জানাই, এতে করে অনেক জায়গা বেঁচে যাবে এবং জনাকীর্ণ পরিবেশ থেকে রোহিঙ্গারা মুক্তি পাবে। এই জনাকীর্ণ আবাসিক পরিবেশ অনেক সমস্যার মূল। **সরকারেরও উচিত রোহিঙ্গা পরিবারগুলিকে যতটুকু সম্ভব স্বনির্ভর করে তোলার সহায়ক**

কর্মসূচিকে অনুমোদন দেওয়া। এতে করে সাহায্যের উপর রোহিঙ্গাদের পরনির্ভরশীলতা কমাবে, তাদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখতেও এই ধরনের কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মিয়ানমারের পাঠ্যক্রম অনুসারে **রোহিঙ্গা শিশুদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও সরকারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে**। এটা বাংলাদেশের সুনামকে সমৃদ্ধ করবে।

দাতাদেরকে ইতিবাচকভাবে আমাদের সরকারের সঙ্গে কাজ করা উচিৎ, সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে আর্থিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশী নাগরিক সমাজের অবস্থা এক্ষেত্রে ইতিবাচক, এ বিষয়ে তাদের প্রচার-প্রচারণার ফলেই সরকার ইউএনএইচসিআরের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং আইসিসি'র (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত) প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে এই ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রচারণা চালাতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দিতে হবে, কারণ স্থানীয় প্রভাবশালী নীতি নির্ধারণী শক্তিশালীগুলোর সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা স্থানীয় সংস্থাগুলো বেশ ভালভাবেই জানে।

৬. স্থানীয়করণের হতাশাজনক চিত্র: রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে জাতিসংঘ এবং আইএনজিওর অংশীদারিত্বের নীতিমালা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা প্রকাশের নীতিমালা প্রকাশ করতে হবে

এসইজি লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স গঠন করলেও, জেআরপি ২০২০-তে এর কোনও প্রতিফলন নেই। যদিও গত দুটি জেআরপি-তে স্থানীয়করণের বিষয়ে অন্তত অল্প কিছু কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো। রোহিঙ্গা সংকট পরিস্থিতি স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠার একটি অনন্য সুযোগ, কারণ জাতিসংঘ গ্রান্ড বারগেন এবং এনডব্লিউওডব্লিউতে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুরু থেকেই সিসিএনএফ এই কথাটি বলে আসছে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আগমনের ২৮ মাস পর এবং লোকাইলাইজেশন টাস্ক ফোর্স গঠনের ৬ মাস পর, রোহিঙ্গা শিবিরে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে কী ধরনের অংশীদারিত্ব আছে তা জানতে গত ডিসেম্বরে কোস্ট ট্রাস্ট একটি জরিপ চালায়। মূলত জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক এনজিও, স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর কার সঙ্গে কার কয়টি অংশীদারিত্ব আছে তা জানাই ছিলো এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য। উখিয়া উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন, টেকনাফ উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন) এবং ৩৪টি শিবির থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল নিম্নরূপ:

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ১৯৮ অংশীদারিত্বের তথ্য পাওয়া গেছে। স্থানীয় এনজিও'র সঙ্গে সাথে অংশীদারিত্ব মাত্র ১৬টি (৮%)! অন্যদিকে, ইউএন-আন্তর্জাতিক এনজিওর অংশীদারিত্বের সংখ্যা ৪৬টি (২৩%), আন্তর্জাতিক এনজিওগুলি সরাসরি ৭০টি প্রকল্প (৩৫%) বাস্তবায়ন করছে। শিবির পর্যায়ে আমরা অংশীদারিত্ব আছে ৩৬৭টি। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক এনজিও-জাতীয় এনজিও'র অংশীদারিত্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১১০টি (৩০%)। স্থানীয় এনজিওর সাথে অংশীদারিত্ব মাত্র ৩৩টি (৯%)।

এই পরিস্থিতি উল্টো 'মানবিক অর্থ সহায়তার আন্তর্জাতিককরণ' বাস্তবায়ন হয়েছে বৈকি। জাতিসংঘ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওদেরকে গ্র্যান্ড বার্গেইন, চার্টার ফর চেঞ্জ এবং এনডাব্লুওডাব্লু-তে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমরা মানবাধিকার এবং শরণার্থী অধিকার রক্ষায় তৎপর স্থানীয় এনজিও বিকাশের স্বার্থে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে **কক্সবাজারে একটি 'পুলড ফান্ডে'র জন্য দাবি জানিয়ে আসছি**। আমরা যদি এটি করতে পারি, তবে আরও অনেক স্থানীয় সুশীল সমাজের সংগঠন গড়ে উঠবে এবং এটি রোহিঙ্গাদের টেকসই এবং উন্নত সুরক্ষা প্রদানে সহায়ক হবে।

আইএনজিও এবং ইউএন সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, মানদণ্ড এবং প্রতিযোগিতার ধরণ নিয়ে স্থানীয় এনজিওদের মধ্যে অভিযোগ ও ক্ষোভ আছে। যেহেতু আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অনেকেরই 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' নীতিমালা নেই, অনেকেরই অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা বা সহজে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা নেই, এই ধরনের অভিযোগ জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। গণমাধ্যমে বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো স্থানীয় এনজিওদের অবদানের স্বীকৃতি খুব কমই দিয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় এনজিওর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ধরণ হয় উপ-ঠিকাদারীর এবং এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় নানা ধরনের বৈষম্যমূলক শর্ত, যা অংশীদারিত্বেকর নীতিমালা (২০০৭) এর সুস্পষ্ট লংঘন, এটি চার্টার ফর চেঞ্জেরও বরখেলাপ। দায়িত্বশীল সুশীল সমাজ সংগঠন গড়ে তুলতে সমতাবিত্তিক এবং পরস্পরের প্রতি সম্মানজনক অংশীদারিত্ব আবশ্যক। যেহেতু রোহিঙ্গা সংকট ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে, তাই স্থানীয় সংগঠনের বিকাশ এবং কর্মসূচিতে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে **জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর স্পষ্ট অংশীদারিত্ব নীতিমালা থাকা বাঞ্চনীয়**।

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনসাধারণ যাতে তাদের ক্ষোভ ও অভিযোগ সহজেই জানানোর জন্য **রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত খুব কম সংস্থারই এমন অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা আছে**। বিদ্যমান অংশীদারিত্বের ধরণ অংশীদারিত্বের নীতিমালা (২০০৭ সালে জাতিসংঘের বড় সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওদের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি

চুক্তি) খুব কমই মেনে চলছে। স্থানীয় ভাষায় উন্মুক্ত এবং সহজ অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

৭. কার্যকারিতা থেকে ফলফ্রসূতার দিকে যাত্রাপথ: জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা এবং ব্যয় হ্রাস করার কার্যকর প্রচেষ্টা

UNOCHA এর তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন দাতা সংস্থা বাংলাদেশে রোহিঙ্গা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য অর্থায়ন করেছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১,৯৭৫.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল পাওয়া গেছে। তার অর্থ, জেআরপি এবং অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য ৯,৯৯৭ ডলার (৭৮৭,৪৬৯ টাকা) এসেছে। **আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রতি মাসে রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য গড়ে ৪৪১ ডলার (৩৭, ০৪৪ টাকা) বরাদ্দের কথা ছিল।**

জেআরপির আওতায় ২০১৭-১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ

	জেআরপি ২০১৭ (ডলার)	জেআরপি ২০১৮ (ডলার)	জেআরপি ২০১৯ (ডলার)	মোট
মোট পরিকল্পনা (মিলিয়ন)	৪৩৪.১	৯৫০.৮	৯২০.৫	২৩০৫.৪
প্রাপ্ত অর্থ (মিলিয়ন)	৪৯৪.২	৭২৭.৭	৭৫৩.৭	১৯৭৫.৬
প্রতিটি পরিবারের জন্য গড় বরাদ্দ	২৯৪০	৩,৪৮১	৩,৫৭৬	৯,৯৯৭
রোহিঙ্গা প্রতি গড় বরাদ্দ	৬৮৫	৮০৩	৮২৫	২৩১৩
রোহিঙ্গা পরিবার প্রতি মাসিক বরাদ্দ	৭৩৫	২৯০	২৯৮	৪৪১ (গড়)
রোহিঙ্গা প্রতি মাসিক বারাদ্দ	১৭১	৬৬	৬৯	১০২ (গড়)

Source: https://fts.unocha.org

জনগণের সাধারণ অনুমান হলো জাতিসংঘ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের পরিচালনা ব্যয় অনেক বেশি। একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী সেই পরিচালন ব্যয় মোট ব্যয়ের প্রায় ৬৫%। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-ও এ ধরণের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। আমরা এই বিষয়ে একটি ছোট জরিপ চালিয়েছি, রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা প্রকাশে আগ্রহ অপ্রতুল হওয়ায় আমাদেরকে পরোক্ষ নানা উৎস্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে (জানুয়ারি ২০২০) এই মুহূর্তে মোট ১,৩৫৪ জন বিদেশি রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে কাজ করছেন।

আমাদের প্রস্তাব, জাতিসংঘের সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহকে তাদের অর্থ ব্যবহার, যানবাহন এবং বিদেশি কর্মীর বিষয়ে নিয়মিত তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। **আমাদেরকে এখন কার্যকারিতা থেকে ফলফ্রসূতার দিকে যেতে হবে এবং স্থানীয়দের কাছে পর্যায়ক্রমে প্রযুক্তি হস্তান্তর/হস্তান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এটি শরণার্থী পরিবারগুলিতে যাওয়া প্রতিটি ডলার পৌঁছানো বাবদ খরচ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবে। শরণার্থী পরিবারগুলির জন্য বার্ষিক প্রত্যক্ষ ব্যয় কত, তহবিলের পরিচালনা / ওভারহেড খরচগুলো কী এবং অংশীদারিত্ব ব্যয় কী – এ বিষয়ে স্বচ্ছ তথ্যও দাবি করছি।**

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও **খরচ কমানোর পরিকল্পনার বিষয়ে জেআরপিতে তেমন কিছু নেই।** যেমন:

i. ঢাকায় অফিস আছে এমন প্রায় সব সংস্থাই কক্সবাজারে সাব অফিস প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেহেতু ঢাকা এবং কক্সবাজারের মধ্যে প্রতিদিন ১২ টি ফ্লাইট রয়েছে, এমতাবস্থায় কক্সবাজারে এ ধরনের অফিসগুলির প্রয়োজন আছে কিনা সেটা বিবেচনা করা উচিত;
ii. রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার কর্মী, সরকারি বিভিন্ন দফতরের কর্মচারী প্রতিদিন কক্সবাজার থেকে শিবিরগুলোতে আসা-যাওয়া করেন, এতে করে প্রতিদিন প্রায় তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে, কক্সবাজারের মতো ছোট একটি শহরের জন্য এটি একটি বাড়তি চাপের সৃষ্টি করেছে। তাই সংশ্লিষ্টদেরকে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোর কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করা উচিত, বিভিন্ন সংস্থার অফিসগুলি উখিয়ায় স্থানান্তরিত করা যেতে পারে;
iii. কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে, ত্রাণ কর্মীদের জন্য প্রচুর গাড়ি ব্যবহার হওয়ায় টেকনাফ ও উখিয়ায় যানবাহনের সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে, যা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরাকে বিঘ্নিত করছে। কক্সবাজার থেকে ত্রাণ কর্মীদের শিবিরগুলোতে যাতায়াতের জন্য কিছু

সাধারণ পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সবাই সমন্বিতভাবে সেগুলো ব্যবহার করলে যানবাহনের চাপ অনেকাংশে কমে যাবে;

iv. রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচির কর্মীদের বেতনভাতা বাংলাদেশের এনজিওদের বাস্তবতা বিবেচনায় স্বাভাবিক অবস্থার বেতন ভাতার তুলনায় প্রায় ২৬৭% বেশি। ভবিষ্যতের জন্য এই জাতীয় বেতন কাঠামো টেকসই কিনা তা নিয়ে নীতি নির্ধরকদের চিন্তাভাবনা করতে হবে, এবং

v. রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে বিদেশীদের সংখ্যা হ্রাস করাও সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে এত বিদেশীর প্রয়োজন আছে কি না তা যাচাই করে দেখার জন্য কোনও গবেষণা কিন্তু নেই। স্থানীয়দের কাছে দক্ষতা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া খুব কমই পরিলক্ষিত হচ্ছে।